শান্তা মারিয়া

সালাম রহমানের কচ্ছপ

কাঁটাবনের ফুটপাতে মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলেন সালাম রহমান। কবুতরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কাঁটাবনে আজকাল পোষা প্রাণীর বেশ অনেকগুলো দোকান গড়ে উঠেছে। সালাম এখানে প্রায়ই আসেন। কচ্ছপের খাবার কিনতে আসেন। শুধু খাবার কিনেই চলে যান না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন খরগোশ, গিনিপিগ, নামি দামি জাতের কুকুর, বেড়াল, পাখি। অবশ্য পাখি পোষার শখ কোন দিনই ছিল না সালামের। তিনি খরগোশ আর গিনিপিগ পুষেছেন, একসময় কুকুরও ছিল বাড়িতে। নিজে হাতে এদের খাওয়াতেন। পাখি পোষার শখ ছিল রেবার। এই মেয়েটি রেবারই বয়সী। না কথাটা ঠিক হল না। রেবার বয়স এখন পঞ্চাশ তো হবেই। আর এই মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশ। যে বয়সে তিনি রেবাকে চিনতেন। রেবা তখন পরতো সালোয়ার-কামিজ। আর এই মেয়েটি পরে আছে ফতুয়া আর জিন্স। আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা পোশাক। চুলের ধরনও অন্যরকম। রেবার চুল ছিল লম্বা, কোমর ছাড়িয়ে যেত। সেই চুল নিয়ে গর্বও কম ছিল না। রেবা ছিল শ্যামলা, এই মেয়েটি বেশ ফর্সা। তবু কোথায় যেন রেবার সঙ্গে খুব মিল লাগছে। হয়তো চোখ-মুখের সেই আলগা লাবণ্যে। রেবার কথা অনেক দিন পর মনে পড়লো। ও তো আর তার প্রেমিকা ছিল না। মনের কোন্ ড্রাইভে কোন্ বিস্মৃত-প্রায় ফাইলে তার স্থান ছিল তা আজও বুঝতে পারেননি সালাম। রেবা নয়, তার সমস্ত জীবনজুড়ে যে ছিল, যে সামনে থাকলে অন্য কিছু ভাবা বা চোখে পড়া ছিল অসম্ভব, সে দ্যুতি অরণী। এরকম নাম যে কোন মেয়ের হয় তা অরণীর সঙ্গে পরিচয়ের আগ পর্যন্ত জানতেন না সালাম। যে মফস্বল কলেজে তার লেখাপড়া সেখানে গুটিকয় মেয়ে ছিল। তাদের কয়েক জনের নাম এখনও মনে আছে শিউলি, ঊর্মি, জলি, শামীমা, সুবর্ণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে দেখলেন দ্যুতি অরণীকে। দেখেই তার মনে হয়েছিল অসাধারণ বিশেষণটা এর জন্যই সৃষ্টি। চৈত্র মাসের সূর্যের মতো সমস্ত পারিপার্শ্বকে একাই অধিকার করে রাখে। প্রখর সুন্দরী তো বটেই তবে সালামকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা রূপ নয়, ব্যক্তিত্ব। নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহমণ্ডলী থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সালাম তাদের মধ্যে ছিলেন না। তিনি মফস্বল থেকে আসা আনস্মার্ট ছেলে। মোটামুটি দূর থেকে ঐ জ্যোতিষ্কের আলো দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু নক্ষত্রেরও তো পছন্দ অপছন্দ থাকে। বৃহস্পতি শনির মতো নামজাদাদের দূরে রেখে নগণ্য বুধকে কাছে টেনে নেয়। দ্যুতির পাশে নিজেকে বুধের চেয়েও নগণ্য মনে হতো সালামের। তবে অন্যদের ঈর্ষা আর বিস্ময় তার অহংবোধকে উদ্দীপ্ত করতো। কাঠুরের ছেলের

গল্প

কপালজোরে রাজকন্যা পেয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিত। দ্যুতির মতো মেয়ে সালামকে কেন পছন্দ করেছিল তা আজও এক রহস্য, তার কাছে, অন্যদের কাছেও।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। গাড়িতে এসে উঠলেন তিনি। ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাটের সামনে এসে নামলেন। এই ধরনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সামর্থ্য সালামের কোন দিনই হতো না। এটা উপহার। দ্যুতির জন্মদিনে তার বাবার দেয়া। দরজায় চাবি ঘুরিয়ে ঢুকতে হলো। কলিংবেল টিপলে দরজা খুলে দেয়ার মতো কেউ সালামের জীবনে এখন আর নেই। গ্রামের বাড়িতে এখনও তার আত্মীয় পরিজনরা আছে। সেখানে আর যে অভাবই থাকুক, সঙ্গীর অভাব নেই। কিন্তু গ্রামের বাড়ির পাট সালামের জীবন থেকে কবে কীভাবে একটু একটু করে মুছে গেল তা তিনি নিজেও জানেন না। তার আত্মীয়স্বজনকে দ্যুতি পছন্দ করতো না। অপছন্দ করে সে কথা বলার মতো অতি সাধারণ মনোভাবের পরিচয়ও সে কখনো দেয়নি। তবে উদাসীন ছিল। এক ধরনের নির্লিপ্ততা যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে তার ছিল সেটা সালাম বুঝতেন। আগাছার ভিড় থেকে নিজের পছন্দসই গাছের চারা তুলে এনে টবে লাগানোর পর সেই আগাছায় ভরা মাঠ সম্পর্কে যে নির্লিপ্তি মানুষকে গ্রাস করে দ্যুতির মনোভাবও অনেকটা সেরকমই ছিল।

সুন্দর করে সাজানো ড্রইংরুমে ঢুকতেই চোখে পড়ে ব্রোঞ্জ রঙের ফ্রেমে বাঁধানো দ্যুতির বিশাল ছবি। আত্মবিশ্বাস ভরা তারুণ্যময় হাসিমুখ। যে হাসি দেখে একদা মুগ্ধ হতো তার চার পাশের পুরুষেরা। পাশের ফ্রেমে রাখা ছবিটা কিছুটা বেশি বয়সের। এটা ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার পরের ছবি। শোকেসে রাখা অসংখ্য পুরস্কার। একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক। পদকগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ শুনলেন বেডরুমের ল্যান্ডফোন বাজছে। সালাম দ্রুত এগোলেন। বেডরুমের সবচেয়ে দর্শনীয় দেয়ালে দ্যুতির পূর্ণায়তন ছবি। নামি ফটোগ্রাফারের তোলা। ছবিটা অদ্ভুত। যেদিক থেকেই দেখা যাক মনে হয় সে জীবন্ত হয়ে তার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে। নিজের ছবি বড় করে বাঁধিয়ে রাখার শখ ছিল তার। এই শখ সিনেমার নায়ক নায়িকাদের থাকে। দ্যুতি অবশ্য ছবির নায়িকা ছিল না। সে ছিল বুদ্ধিজীবী নারী, এদেশের বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী। যদিও রূপের জোরে সে অনায়াসেই যে কোন নায়িকাকে হার মানাতে পারতো। সালামের মনে হয় রাজাবাদশাহর আমল হলে দ্যুতি হয়তো নিজের জন্য একটা শীষমহল বানাতো। যেখানে চতুর্দিক থেকে প্রতিফলিত হবে তার নিজের চেহারা। নার্সিসাস, পুরোপুরি নার্সিসাস। কথাটা না ভেবে পারলেন না সালাম। আজকাল মাঝে মধ্যেই তার মনে হয় দ্যুতি বোধহয় এজন্যই তাকে বেছে নিয়েছিলো। নিজের চেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাউকে সে সহ্য করতে পারতো না। সালাম টেলিফোনটা ধরলেন। খবরের কাগজের অফিস থেকে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দ্যুতির মৃত্যুবার্ষিকী। পালিত হবে ঘটা করে। বিভিন্ন নারী সংগঠন আর মানবাধিকার সংগঠনগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোচনা, সভা, সেমিনার করবে। স্বামী হিসেবে তার স্মৃতিচারণ ছাপা হবে পত্রিকায়। আলোচনা সভাগুলোতে তিনি হবেন বিশেষ অতিথি।

তিনি সালাম রহমান দ্যুতি অরণীর স্বামী। স্বামী শব্দটা মনে মনে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন সালাম। স্বামী মানে তো প্রভু, অধিপতি। তিনি কি কখনো দ্যুতি অরণীর স্বামী ছিলেন? প্রভু অর্থটা এখন অচল বলেই ধরা যায়। আচ্ছা যদি সঙ্গী হিসেবে ভাবা যায় তাহলেই কি তিনি দ্যুতির পরিপূর্ণ সঙ্গী ছিলেন? হ্যাঁ দ্যুতির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তার ছিল। শীতল ঝিমিয়ে পড়া সম্পর্ক নয়, পুরোপুরি উষ্ণ, তীব্র। মাঝে মাঝে তার কিছুটা ক্লান্তি ভর করলেও দ্যুতির কোন ক্লান্তি ছিল না। কখনো কখনো রাতে দ্যুতিকে দেখে তার ভয় হতো, মনে হতো বাঘিনী। বিশেষণটা খুব সেকেলে বলে মনে হলো নিজের কাছেই। দ্যুতি অরণীকে আর যাই হোক বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। সে নিজের চাহিদা মিটিয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়তো। রাত জেগে থাকতেন সালাম। আগের মতো এখনো রাতের পর রাত তার নির্ঘুম কাটে। আগের মতো এখনও তিনি নিঃসঙ্গ। দ্যুতির সঙ্গে অসংখ্য কথা হতো তার। কিন্তু তিনি অনুভব করতেন তার কথা সে খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। সালামের আনন্দ বেদনার অংশীদার সে কোন দিন হতে পারেনি কিংবা হতে চায়নি। সালামই কি হতে পেরেছিলেন? দ্যুতি ভালবাসতো রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ,

প্রকৃতির স্থায়ী বিধানেই দ্যুতি পুরুষদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই কৈশোর থেকেই। সালামের সঙ্গে পরিচয়ের আগে কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কি না তা তিনি জানতে চাননি কখনো। কেন জানতে চাননি? অপ্রিয় সত্য শুনতে হবে এই ভয়ে কি? বিবাহিত দ্যুতি অরণীর প্রতিও তো পুরুষদের মুগ্ধতা কম ছিল না। দ্যুতির সঙ্গে যে কোন অনুষ্ঠানে, সভা-সমিতি, বিয়ে বাড়ি, ডিনার সর্বত্র সালাম তার চেনা অচেনা পুরুষদের চোখে মুগ্ধতা ঝরে পড়তে দেখেছেন। বিষয়টি তার অসহ্য লাগতো। এজন্য পারতপক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে যেতে চাইতেন না। তার যেতে চাওয়া না চাওয়া নিয়ে দ্যুতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। একাই চলে যেত

দর্শন এগুলো নিয়ে অনবরত কথা বলতে। প্রতিটি বিষয়ে তার মতামত ছিল সুস্পষ্ট। এমনকি ধর্ম নিয়েও তার নিজস্ব কী একটা মতামত ছিল যা সালাম কোন দিনও বুঝতে পারেননি। নিজেকে দার্শনিক ভাবতে সে ভালবাসতো। সালামের কাছে তা অত্যন্ত হাস্যকর মনে হতো। ভদ্রতা করে সে কথা কখনো তিনি প্রকাশ করেননি। দ্যুতির কথাগুলো তিনি শুধু শুনে যেতেন। কারণ কথা বলার জন্য একজন শ্রোতা প্রয়োজন হয়। অনেক কথা সে তার আয়নাটাকেও বলতে পারতো। ওর কথা শুনে মনে হতো এগুলো যেন নিজের সঙ্গে নিজের কথা। কিংবা নিজের অহংকে আরও উঁচুতে তুলে ধরে নিজের দিকে নিজেই তাকিয়ে বিমুগ্ধ হওয়ার জন্য বলা।

রাতের খাবারের জন্য আয়োজন করা দরকার। বাড়িতে কোন কাজের মেয়ে নেই। তিনি রাখেন না। এই বয়সে চরিত্রের ওপর আচমকা দোষ দেওয়া তার বরদাস্ত হবে না। আলগা বুয়া আছে। কাজ করে চলে যায়। পঞ্চাশ বছরে সালাম সম্পূর্ণ কর্মক্ষম। এমনকি তার শারীরিক তৃষ্ণাও পরিপূর্ণ ভাবে আছে। সে তৃষ্ণা মেটানোর মতো কেউ নেই। টাকার বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তা পেতে তার ইচ্ছা হয় না।

দ্যুতি চলে যাওয়ার পর ফুফাতো বোনের ননদ সীমা প্রায়ই এ বাড়িতে আসে। সীমা ঢাকাতেই থাকে। কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। পরে সম্ভবত যৌতুকের জন্যই সংসারটা ভেঙ্গে যায়। সালাম কানাঘুষায় শুনেছিলেন সীমার স্বামীর পৌরুষত্বে ঘাটতি ছিল। তবে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করার কোন প্রবৃত্তি তার হয়নি। সীমা সালামের চেয়ে বয়সে যথেষ্ট ছোট। এক সময় তাকে তুই বলে ডাকতেন। একই গ্রামের মেয়ে হিসেবে প্রায় তার সামনেই ওর বেড়ে ওঠা। মফস্বল শহরের কলেজে, পরে ঢাকায় কষ্ট করে ওর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পিছনে যে অদম্য জিদ ছিল তার কদর না করে তিনি পারেননি। আঠার/উনিশ বছরের একটি বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া মেয়ের হোস্টেলে থাকা, নিজের পড়ার খরচ চালানো, টিউশনি, তারপর চাকরি খোঁজার ইতিহাস, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম- লিখলে হয়তো মহাভারত

হয়ে যেত। দ্যুতির সঙ্গে সীমার কোন তুলনা করার কথা ভাবতেও পারেন না সালাম। তবু মনে মনে না ভেবেও পারেন না যে দ্যুতি যতই মুখে নারী অধিকারের কথা বলুক, সেমিনারে পেপার পড়ে প্রশংসা পাক, সীমার জীবনের সংগ্রাম উপলব্ধি করার কোন ক্ষমতাই তার কখনো ছিল না। মধ্য তিরিশের সীমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মধ্যে খুব আগ্রহ বোধ করেন সালাম। সালামের বাবার বাড়ির আত্মীয়রা প্রায়ই তাকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করে। এ সময় দ্যুতির মৃত্যুর কথা মনে পড়ে সালামের। পুরোপুরি সুস্থ, পঁয়তাল্লিশেও দুর্দান্ত সুন্দরী দ্যুতি মিটিং থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ম্যাসিভ অ্যাটাক। ভাগ্য ভালো সালাম তখন বাড়িতেই ছিলেন। মৃত্যুর চোখে চোখ রেখেও সালামকে সে আর বিয়ে না করার নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর শুধু একটি উচ্চারণ 'ওহ্ এভাবে কেন? এটা কোন সময় হল'? মৃত্যুর সড়কে পা রেখে একজন মানুষ কীভাবে স্বামী আবার বিয়ে করবে কিনা এরকম তুচ্ছ বিষয়ে ভাবতে পারে তা ভেবে সালাম আজও বিস্ময়ে থমকে যান। দ্যুতির শেষ উচ্চারণটাও তাকে ভাবায়। মৃত্যু নিয়েও কি তাহলে ওর অনেক পরিকল্পনা ছিল। নিখুঁত প্ল্যানিংয়ের জন্য, নিখুঁত বক্তৃতার জন্য, সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য ওর খ্যাতি ছিল। সেকি ভেবেছিল মৃত্যুও আসবে তার প্ল্যানিং প্রোপোজাল অনুযায়ী। মৃত্যুর সময় একমাত্র সন্তানকে স্মরণ না করা, তার নাম উচ্চারণ না করার বিষয়টিও সালামকে হতবাক করে। দার্জিলিংয়ের স্কুল থেকে ছুটে আসা ঐন্দ্রিলাকে পরে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। বলেছিলেন মৃত্যুর আগে মা তাকে অনেক দেখতে চেয়েছিল। ঐন্দ্রিলা সান্ত্বনা পেয়েছিল। নিঃসঙ্গ বাবাকে রেখে সে ফিরে গিয়েছিল প্রথমে দার্জিলিং আর পরে বার্কলেতে। বার্কলে থেকে ঐন্দ্রিলা প্রায়ই তাকে ফোন করে। তার খোঁজখবর নেয়। সালাম চোখ বন্ধ করলে আজও দ্যুতির নিষ্প্রাণ শুয়ে থাকার দৃশ্যটা দেখতে পান। তখনও তার মুখে ব্র্যান্ডেড প্রসাধন। মৃত্যুর গন্ধকে ছাপিয়ে নাকে আসছিল তার প্রিয় পারফিউমের ঘ্রাণ। তারপর এই পাঁচ বছর ধরে সালামের একক অভিযাত্রা। বিয়ে করার কথা তিনি নিজেও যে ভাবেননি তা নয়। তারুণ্যে চেনা পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়েছে। আজ যেমন বহুদিন পর রেবার মতো মেয়েটিকে দেখে রেবাকে দেখার একটা ক্ষীণ ইচ্ছা বোধ করছেন তিনি।

রাত হলো। সালাম উঠলেন। কচ্ছপগুলোকে খাওয়াতে হবে। দুটি কচ্ছপ। ছেলে মেয়ের জুটি। তিন বছর হয়ে গেল। প্রথম দিকে বুঝতে পারেননি কোনটি মেয়ে, কোনটি ছেলে। পরে তাদের সংগম প্রক্রিয়া দেখে চিনতে পেরেছেন। জীব জগতের প্রজাতিগুলোর যৌনক্রিয়া জাত অনুযায়ী ভিন্ন হলেও গত্ বাঁধা। মানুষই শুধু বৈচিত্র্য খোঁজে। বৈচিত্র্যর জন্য মানুষ সঙ্গী পাল্টাতেও দ্বিধা করে না। মানুষের এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তিরিশ লাখ বছরের অভ্যাস। জিনগত বৈশিষ্ট্যের আদান প্রদানে যা ছিল অত্যাবশ্যকীয়। অন্তর্গত সেই বহুগামিতার প্রবৃত্তিকে মানুষ নিজের সৃষ্টি কতগুলো নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আটকে রাখতে চায়। আবার দ্যুতির কথা মনে পড়লো তার। প্রকৃতির স্থায়ী বিধানেই দ্যুতি পুরুষদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেই কৈশোর থেকেই। সালামের সঙ্গে পরিচয়ের আগে কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কি না তা তিনি জানতে চাননি কখনো। কেন জানতে চাননি? অপ্রিয় সত্য শুনতে হবে এই ভয়ে কি? বিবাহিত দ্যুতি অরণীর প্রতিও তো পুরুষদের মুগ্ধতা কম ছিল না। দ্যুতির সঙ্গে যে কোন অনুষ্ঠানে, সভা-সমিতি, বিয়ে বাড়ি, ডিনার সর্বত্র সালাম তার চেনা অচেনা পুরুষদের চোখে মুগ্ধতা ঝরে পড়তে দেখেছেন। বিষয়টি তার অসহ্য লাগতো। এজন্য পারতপক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে যেতে চাইতেন না। তার যেতে চাওয়া না চাওয়া নিয়ে দ্যুতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। একাই চলে যেত। অনুষ্ঠান থেকে এসে অসংকোচে গল্প করতো কীভাবে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাকে দেখে বিগলিত হয়ে কী কী প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তার অসংকোচ বিবরণ শুনেই সালাম বুঝতেন পুরুষদের চাটুবাক্য তার অহংবোধকে তৃপ্ত করে মাত্র, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। হয়তো এ কারণেই সালাম সচেতন ভাবে কখনো ঈর্ষা বোধ করেন নি। তাছাড়া তিনি জানতেন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে দ্যুতির হৃদয়ঘটিত কোন সম্পর্ক নেই। সালামকে ছাড়া অন্য কাউতে সে ভালোও বাসে না।

কথাটা ভেবে সালামের হাসি পেল। কারণ তিনি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দ্যুতি কখনো ভালোবাসেনি এমনকি ঐন্দ্রিলাকেও নয়। সালাম কিছুটা হালকা বোধ করলেন। তার মনে হল

আবার সঙ্গী গ্রহণ করার নৈতিক অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু কে সে? সীমা না অন্য কেউ। কচ্ছপ দুটিকে খাওয়াতে খাওয়াতে ভাবছিলেন সালাম। মেয়ে কচ্ছপটি অনেক সাহসী। তাকে দেখলেই পানির ওপর মাথা তুলে ভেসে ওঠে। প্রায় তার হাত থেকেই খেতে চায়। ছেলে কচ্ছপটি ভীতু ধরনের। একটু শব্দ শুনলেই লুকিয়ে পড়ে নুড়ি পাথরের আড়ালে। কচ্ছপ দুটি যখন কিনেছিলেন তখন তারা প্রায় একই আকারের ছিল। কিন্তু এই তিন বছরে মেয়ে কচ্ছপটা আকারে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ছেলে কচ্ছপটাকে দেখে কেন যেন নিজের কথা মনে পড়ে সালামের। কচ্ছপগুলোকে হাতে তুলে নিয়ে আবার সীমার কথা ভাবলেন তিনি। রেবার কথাও চকিতে আরেকবার মনে হল। সালামের বাড়ির উল্টো দিকেই ওদের বাড়ি ছিল। বারান্দায় ঝুলানো পোষা পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো রেবা। হাসলে তার গালে টোল পড়তো। একথাও মনে পড়ল তার। অদ্ভুত মিষ্টি লাগতো শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে। গ্রামের কার কাছে যেন শুনেছিলেন রেবা এখন বিধবা। অবশ্য বিধবা হলেই যে সে সালামকে বিয়ে করতে রাজি হবে তা নয়। এমনকি এখন হয়তো রেবার

কথা ভাবাও পাগলামি।

গত বছর তার চাচাতো ভাই আনিস একটি বিয়ের প্রস্তাব এনেছিল। মেয়েটি তার দূর সম্পর্কের শালী। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। বাবা-মা নেই। ভাইয়ের বাসার বিনে পয়সার বুয়া। শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব বেশি নয়। দেখতেও সাদামাটা। খরচের ভয়ে ভাই বিয়ে দেয়নি। সালাম রাজি হলে মেয়েটি রীতিমতো কৃতজ্ঞ থাকবে। আনিস সে সময় মেয়েটির একটি ছবিও দিয়েছিল।

সালাম তার একেবারে নিজস্ব ছোট ঘরটিতে এসে বসলেন। মাস্টার বেডরুমটি বড়। সাজানো। তাদের দুজনের হলেও সবসময়ই তার মনে হতো সেটি দ্যুতির একার। এই ঘরটি বাড়ির গেস্টরুম হিসেবে মাঝে মধ্যে ব্যবহৃত হতো। দ্যুতি বেঁচে থাকতে এ ঘরেই সালাম লুকিয়ে সিগারেট খেতেন। এখানে তার নিজস্ব একটি টেবিলও আছে। এর ড্রয়ারে আনিসের শালীর ছবিটা রেখেছিলেন। এখন খুঁজে সেটা বের করলেন। গত বছর তিনি বিয়েতে রাজি হননি। কিন্তু ছবিটা ফেলেও দেননি। সালোয়ার-কামিজ পরা মেয়েটি। বয়স ছত্রিশের চেয়ে কিছুটা বেশি বলেই মনে হয়। মেয়েরা যখন নিজের বয়সের চেয়ে বড় সাজতে চায় তখন শাড়ি পরে আর যখন ছোট সাজতে চায় তখন সালোয়ার-কামিজ পরে। এই ঘরে দ্যুতির কোন ছবি নেই। কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে সালাম ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। থ্রি আর সাইজের ছবিতে পিছনে নাম লেখা ফারজানা। খারাপ নয়, চেহারায় কমনীয়তা আছে। রং কালো বলেছিল আনিস। ছবিতে ভালোই লাগছে। এ দেশে শ্যামল রং রমণীর সুনাম শুনেছি মনে মনে ভাবলেন সালাম। দ্যুতি ছিল ফরসা। শুধু ফরসা নয়, যাকে বলে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। সালামের কিন্তু সব সময় ভালো লাগতো শ্যামবর্ণাদের। গত বছর আনিসকে সালাম বলেছিলেন, পঞ্চাশ হতে চললো, আর কদিনই বা বাঁচবো। এখন বিয়ের কথা ভাবাও অন্যায়। আনিসও বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চাপাচাপি করেনি। সালাম নিভৃতে নিজেকে আবার অনুভব করলেন। পঞ্চাশ এমন আর কি বেশি বয়স। তার বাবা দাদা দুজনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি যদি তাদের মতো আয়ু পান? যদি আশি বা নব্বই পর্যন্ত বাঁচেন? আচ্ছা নিদেনপক্ষে সত্তর বছরই না হয় ধরা গেল। তাহলে আরও বিশ বছর তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেঁচে থাকতে হবে। কচ্ছপ দুটো নিঃসঙ্গ নয়। কিন্তু কচ্ছপের আয়ু নিয়ে তাকে যদি একা থাকতে হয়। দ্যুতির শেষ নির্দেশটার কথা আরেকবার ভাবলেন সালাম। দ্যুতি কি মৃত্যুর পরও তাকে রেহাই দিবে না? এখনও তার নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে? কেন? দ্যুতি বেঁচে থাকতে সারাজীবন নিজেকে খোলসের মধ্যে গুটিয়ে রেখে চলতে হয়েছে। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সত্তায় একটা বিদ্রোহ অনুভব করলেন, তিনি। তাকে কচ্ছপ নয়, মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে।

এই বিদ্রোহটা দ্যুতি বেঁচে থাকতে দেখাতে পারলে আরও ভালো হতো। তাহলে দ্যুতি অরণী তার বড় বড় চোখ মেলে কি বিস্ময়ে সালামের দিকে তাকাতো একথা ভেবে তার হাসি পেল। অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলেন তিনি। ছোট ঘরটার সিঙ্গেল খাটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে তিনি মনে মনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন হ্যাঁ বিয়ে। নিশ্চয়ই। কেন নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি সালাম রহমান। মৌলবী আবদুর রহমানের ছেলে। আমি বিয়ে করবো তাতে কার কি। এই সিগারেটটার মতো ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই। বিয়ে, অবশ্যই। নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন করার পুরো অধিকার আমার আছে। খুব দৃঢ়ভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার মনে হলো সীমা অথবা ফারজানা। দুজনের প্রতিই মনের মধ্যে একটা কোমলতা অনুভব করলেন সালাম। কল্পনায় দেখলেন সীমা তার জন্য খাবার বেড়ে দিচ্ছে। ফারজানাকেও শাড়ি পরা অবস্থায় কল্পনা করার চেষ্টা করলেন। বেশি লোক জানাজানির দরকার নেই। দুই চারজন চেনা পরিচিত, আর ভাই বোনেরা। অনুষ্ঠান দরকার হবে না। কিংবা কোন চাইনিজে হালকা আয়োজন। কত টাকা লাগতে পারে সে হিসাবটাও করা দরকার। কিন্তু পাত্রীটা কে? সীমা না ফারজানা? হ্যাঁ এটাও একটা গুরুতর প্রশ্ন। ফারজানা ভালো। সীমাও ভালো মেয়ে। সবচেয়ে বড় কথা সীমা তার চাহিদাগুলো বোঝে। সালামকে সম্মান করে। গত পাঁচ বছর ধরেই সীমা এ বাড়িতে আনাগোনা করছে। লেখাপড়া জানা শিক্ষিত ম্যাচিওর মেয়ে। তার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা কঠিন হবে না। কাল অথবা পরশু হয়তো সীমা আসবে। সপ্তাহে অন্তত একবার সে আসেই। সীমাকে কী বলবেন মনে মনে তা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন সালাম। তিনি বলবেন একা থাকাটা খুব কষ্টের সীমা। তুমিও নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বোঝ। এসো আমাদের কষ্টটাকে আমরা দুজন শেয়ার করে নেই। হ্যাঁ, এটুকু বললেই সীমা নিশ্চয়ই বুঝবে। এ বয়সে তিনি খুব বেশি আবেগের প্রকাশ ঘটাবেন না। ঐন্দ্রিলা কি কিছু মনে করবে? ঐন্দ্রিলার শৈশবের চেহারা মনে পড়লো তার। একমাত্র সন্তানকে দার্জিলিংয়ে পাঠানোয় তার আপত্তি ছিল। বিদেশে পাঠাতে হবে কেন? ঢাকায় কি স্কুলের অভাব। ভিকারুননেসা, হলিক্রস, স্কলাসটিকা, মাস্টার মাইন্ড নামগুলো একের পর এক আওড়ে ছিলেন। কিন্তু দ্যুতি থামিয়ে দিয়েছিল তাকে। দেশে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। এই খোঁড়া যুক্তিতে সবাইকে চুপ করিয়ে ঐন্দ্রিলাকে নির্বাসনে পাঠানো হল। কেন? সালাম মনে মনে কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। ঐন্দ্রিলা তার মায়ের চেয়েও মেধাবী আর সুন্দরী ছিল বলে কি দ্যুতি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতো। মেধা ও সৌন্দর্যে সে কি নিজ সন্তানের উৎকর্ষও সহ্য করতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা এখন বার্কলেতে লেখাপড়া করছে। লেখাপড়া শেষ করে ওখানেই সেটেল করবে। দেশে আসবে হয়তো বাবার অসুখ কিংবা মৃত্যুর খবর পেয়ে। জন্মের পর সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে কত নিবিড়। অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত দূরের মানুষ হয়ে যায়। সালাম নিজেও কি তার বাবা মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। বাবা-মা বেঁচে থাকতেই বা তিনি কবার গ্রামের বাড়িতে গেছেন। ঐন্দ্রিলা বিদেশে থাকে। তার মনটা নিশ্চয়ই উন্নত পরিবেশে থেকে অনেক বেশি উদার হয়েছে। বাবার দ্বিতীয় বিয়ে সে হয়তো সহজভাবেই নেবে। বাবার জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি। মাঝে মধ্যে টেলিফোন— এই তো। তারা দুজন তো আসলে দু গ্রহের বাসিন্দা। না, তার বিয়েতে ঐন্দ্রিলা কোন বাধা নয়। কাথাটা ভেবে আরও হালকা বোধ করলেন সালাম। তার মনে হল যে একাকিত্ব গত পাঁচ বছর ধরে এবং সত্যি বলতে কি দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই যে নিঃসঙ্গতা তার ভিতর বাসা বেঁধেছে তা থেকে তাকে যেন মুক্তি দিতে পারবে সীমা। তিনি মনে করে দেখলেন সীমা যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকে তার সময়টা খুব ভালো কাটে। ওর সঙ্গে বাকি জীবনটা ভালো না কাটার কোন কারণ নেই। কাল কি সীমা আসবে?

দেখা যায় ভাবনারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তা করলে ধীরে ধীরে চিন্তার গতিও শ্লথ হয়ে আসে। বিয়ের চিন্তাগুলো সালামের মাথার ভিতর ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। এ ঘড়িটা দ্যুতি তাকে উপহার দিয়েছিল। দ্যুতির এ স্বভাবটা রীতিমতো আদিখ্যেতা বলে মনে হতো তার। জন্মদিন, ম্যারেজডে তো আছেই এমনিতেও কোন অকেশন ছাড়াই দ্যুতি তাকে সারপ্রাইজ গিফট দিত। র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়া ফুল কিংবা চকলেটসহ এটা ওটা উপহার পেতেন তিনি। সঙ্গে গিফটকার্ডে লেখা থাকতো কোন কবিতার লাইন। বিষয়টি তার কাছে অসহ্য ন্যাকামি বলে মনে হতো। কিন্তু উপহার পেয়ে মুখটাকে হাসি হাসি করে তোলা ছাড়া উপায় ছিল না। সালামের মনে হল তার আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়ের সব অনুভূতি দ্যুতি তার হাতের ইশারায় নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতো।

রাত তিনটা। সালাম উঠলেন। এ ঘরেই তিনি ইচ্ছা করলে শুয়ে থাকতে পারেন। বাধা দেয়ার তো কেউ নেই। তবু দীর্ঘদিনের অভ্যাসকে মেনে নিয়ে মাস্টার বেডরুমের দিকেই পা বাড়ালেন। ড্রইং, ডাইনিং পেরিয়ে তবে বেডরুম। বিয়ের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে বহন করে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। দ্যুতির ক্রেস্টগুলো আবার চোখে পড়লো তার, বড় ছবিটাও। একটু মিইয়ে গেলেন তিনি। তবু বিয়ের চিন্তাটা আঁকড়ে রেখে দ্রুত পায়ে ডাইনিং পেরিয়ে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বেডরুমে ঢুকে দ্যুতির চোখে চোখে তাকাবেন ভেবেছিলেন কিন্তু পারলেন না। দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে খাটে এসে বসলেন। বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রাখতেই দ্যুতির কঠিন অথচ মোহময় সেই পুরনো দৃষ্টিটা অনুভব করলেন তিনি। ছবির ভিতর থেকে দ্যুতি তাকিয়ে আছে তারই দিকে নির্নিমেষে। সালাম অনুভব করলেন তার পিঠটা শক্ত হয়ে উঠছে। শক্ত খোলসে ঢেকে যাচ্ছে তার পুরো পিঠ। মেরুদণ্ডটা একদলা মাংস হয়ে ঢুকে যাচ্ছে খোলসের ভিতরে। হাত-পাগুলো বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। ঘাড়, গলা, কাঁধ অন্তরাত্মাসমেত গুটিয়ে যাচ্ছে খোলসের ভিতরে। সালাম বুঝলেন সীমাকে তার কোন দিনও কিছু বলা হবে না। আজীবন দ্যুতি অরণীর স্বামী হয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটুকু চিন্তা করার পরই সালাম রহমান একটা কচ্ছপ হয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।